‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’

কিছু কিছু বিষয় আছে দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে এত সম্পৃক্ত যে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুজে বসে থাকা সম্ভব হয় না, আবার কথা বলতে গেলে মুখে খারাপ ভাষা চলে আসে, উচিত কথা বেরিয়ে পড়ে; নিজেই নিজের ঝুঁকি তৈরি করে। আমার মতো দুর্মুখ মাস্টারসাহেবের জন্য এটা অনেকটা সত্য। স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকগুলো এতে নাখোশ হয়। শেষে জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তখন রাজশাহীর ভাষা দিয়ে টেনে টেনে বলতে হয়, ‘কথা বুল্লেই তো বুইলবেন যে বুইলছে’। কিন্তু এ ভূখণ্ডে জীবনযাপন করতে গেলে কথা তো বলতেই হয়, না বলে যে উপায় থাকে না! তাই এত প্রাক্‌কথন। বিলের পানিতে নেমে কলমিলতার একটা লতা ধরে টান দিলে অনেকদূর পর্যন্ত লতার পাতাগুলো মাথা নাড়ে– একটার সাথে আরেকটার পারস্পরিক সংযুক্তি আছে বলে। প্রতিটা মানুষের জীবনযাপনের সাথে এমনই সমাজজীবনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, আইনকানুন, দেশ-পরিচালকদের মন-মানসিকতা, দেশপরিচালনাসহ অনেককিছুই জড়িয়ে যায়। তাই তো মানুষ ভোটের মাধ্যমে মনমতো দেশ-পরিচালক নির্বাচিত করতে চায়; অন্তত সুখে-শান্তিতে বসবাস করার আশা নিয়ে। আর ভাবে, ‘আমাদের দেশ-পরিচালকরা যেন জেগে না ঘুমান, তাহলেই জাগানো কঠিন’। কারণ আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কোন অদৃশ্য শক্তির ইশারায় যে বাজারের প্রতিটা পণ্য ও সেবার দর ওপরের দিয়ে ধেয়ে চলেছে, এর কোনো সদুত্তর আমাদের জানা নেই। তবে পথ চলতে যখন রিক্সায় চড়ি, ফুচকা-চটপটি কিনে খাই, ব্যাগ হাতে বাজারে যাই, জীবনের ক্ষুধা মেটাই, তখন ‘কত ধানে কত চাল’ বোঝা যায়। এজন্য সাধারণ মানুষের জীবন নির্বাহ ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠেছে। বাস্তবে দেখছি, খেটে-খাওয়া মানুষের জাঁকান্দানি শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের আয় বাড়ছে না। দিনে দিনে টাকা তার ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঘাড়ে শনির দশা ভর করেছে। সে শুধু লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরেই উঠতে জানে। সাধারণ মানুষ অসহায়। দেশ-পরিচালকদের মুখের দিকে তাঁকিয়ে হা-হুতাশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কখনো নিয়তির ওপর দায় চাপিয়ে নিজেকে ধিক্কার দিই। কিন্তু ঘটনা কি আসলেই তাই?

দেশ-পরিচালকরা দ্রব্যমূল্যের সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা করেন না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও চেষ্টা করেন না, নতুন কোনো বন্টন পদ্ধতির খোঁজ করেন না, সিন্ডিকেট-সদস্যদের নিজের লোক বলে ভাবেন, দেশবাসীকে আশার কথা শোনান। অন্য কোনো দেশের এহেন অবস্থার রেফারেন্স দিয়ে আমরা বেহেশতের বাগানে শান্তিতে আছি বলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন। কখনো ‘পুলিশ লাশ উদ্ধার করিয়াছে, তদন্ত চলিতেছে’ এ-জাতীয় দায়সারা কথা বলে পরিত্রাণের ভাব দেখান। এখানেই যত বিপত্তি এসে ভর করে। কথাও সত্য। আমরা আম-জনতা আমাদের চামড়ার চোখ মেলে তো তাই-ই দেখছি। এদেশের মতলববাজ ব্যবসায়ীরা দেশ পরিচালকদের বশে এনে ফেলেছেন। কীভাবে বশে এনেছেন, সাধারণ মানুষ তা জানে না, অনুমান করে। এসব মতলববাজ ব্যবসায়ীদের শুধু ব্যবসায়ী না বলে আমার মতো দুর্মুখেরা ব্যবসায়ী-রাজনীতিক বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। কারণ তাদের হাতেই সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে কলকাঁঠি নাড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ক্ষমতার বলয় গড়ে তোলার রাজনৈতিক ক্ষমতা। রাজনীতিবিদরাও আম-জনতাকে ভুলে নিজেদের ও ব্যবসায়ীদের টাকার ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে রাজনীতিবিদ নামকে রাজনীতিক-ব্যবসায়ী অভিধায় পর্যবসিত করেছেন। সাধারণ মানুষের দিকে দৃষ্টি কম। দৃষ্টি টাকা ও ক্ষমতার দিকে। টাকা ছিটিয়েই ভোটে পাশ করা যাবে, এমনটি ভরসা। একটা শেণির টাকা এবং ক্ষমতাই এ দেশের মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তায় রূপ নিয়েছে। যাদের দায়িত্ব পালন করার কথা, তারা যে কোনো দায়-দায়িত্বকে ঠুনকো একটা কথা বলে এড়িয়ে যেতে চায়। কখনো জেগে ঘুমায়। এদিকে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস বয়ে যায়।

জীবনযাপন দিয়ে শুরু করেছিলাম। দেশের করকাঠামো জীবনযাপনের একটা প্রত্যক্ষ অংশ। গত ৩০শে নভেম্বর আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ দিন ছিল। মেয়াদ বাড়িয়ে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ করা হয়েছে। করমুক্ত আয়ের শেষসীমা বাৎসরিক তিন লাখ টাকা। অর্থাৎ মাসিক আয়-রোজগার যাদের অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা তাদেরকেই আয়করের আওতায় আনা হয়েছে। জানা মতে, কোনো পিয়ন, ড্রাইভার, দিনমজুর প্রভৃতি বাদে প্রত্যেককেই মাসে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা রোজগার না করলে কখনো কখনো উপোস থাকতে হয়। এদের আমরা কর দিতে বাধ্য করছি। এদের আমরা 'করদাতার' খাতায় নাম লেখাতে চাচ্ছি। আমরা ব্যক্তিখাতে করের আওতা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। এদেশে কত অবৈধভাবে অর্জিত কোটি কোটি টাকার মালিক কর না দিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছে, তাদের করের আওতায় আনা হচ্ছে না কেন? কত হাজার হাজার কোম্পানি হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করে, নামমাত্র কর দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে, তাদের হিসাবটা কে নিচ্ছে? যত দায়তে পড়েছে কায়ক্লেশে জীবনধারণরত ছা-পোষা আইনমান্যকারী ব্যাঙের আধুলি নিয়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে আয়ের একটা অংশ সরকারকে কর হিসেবে দিয়ে করদাতার ক্রয় ক্ষমতা বৈধভাবে কমিয়ে ফেলছি। তারা অবৈধ রোজগারকারীদের সাথে ক্রয় প্রতিযোগিতায় কোনোক্রমেই পেরে উঠছে না। সমাজজীবনে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা পণ্য ও সেবা ভোগকারীকে জীবনযাপনের প্রতিটি পদে পদে অগণন ক্ষেত্রে ভ্যাটও দিতে হচ্ছে। এটাও তো একটা কর। দেশের পুরো অর্থব্যবস্থা অবৈধ আয়-রোজগারকারীর দখলে। তাদের রোজগারের পুরোটাই করমুক্ত আয়। তাদের আয়কর দেওয়া লাগে না। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। এ দেশে তাদের জয়জয়কার। সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখার কে আছে? আমরা কি করদাতাদের তেমন কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি? সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারছি? কর আদায়ের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার জন্য যে আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হচ্ছে, তার অনেকটাই লুটপাট-দুর্নীতি, অব্যবস্থা, দলীয় লোক-প্রতিপালনের নামে সিস্টেম লসে খেয়ে ফেলছে। এ বাস্তবতায় খেটে-খাওয়া নীতিবান মানুষ আয়করই-বা দিতে চাইবে কেন? নীতিই তাদের কাল হয়েছে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার এসব বিবেচনায় এনে দেশের প্রতিটা পেশার সুবিধাবাদি চালাক-চরিত্রের লোকজন তোষামোদি করে রাজনৈতিক-ক্ষমতার কাছে যাওয়ার অবিরাম প্রতিযোগিতায় নেমেছে; অনেকেই ক্ষমতার বলয়ের মধ্যে পৌঁছে গেছে। স্বার্থের মধু অনবরত চেটে চলেছে। কোষাগার শূন্য হবার পথে বসে গেছে; তবু চেটে চলেছে। এভাবে জীবনযাপন সুস্থ থাকে কী করে? দেশের অর্থব্যবস্থাই-বা ভালো থাকে কী করে?

কয়েক দিন ধরেই কোনো কোনো দৈনিকে, আবার সোস্যাল মিডিয়ায় 'ব্যাংক লুটপাট' বিষয়টা 'টক অব দ্য টাউন' হয়ে গেছে। যা ঘটেছে, তার থেকে অনেক বেশি পক্ষে-বিপক্ষে গুজব রটছে। গুজবে কান না দিয়েও কোনো উপায় নেই। এর আগেও যতবার 'অর্থ লুটপাটের' খবর বেরিয়েছে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সেটাকে ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট হয়েছে, ক্ষতকে সারাতে এন্টিবায়টিক ব্যবহার না করে ক্ষতের উপর স্বার্থকভাবে মলমের প্রলেপ দিয়েছে। সাধারণ নাগরিকের কাছে ঘটনা সত্য বলে প্রতিয়মান হয়েছে। জীবনযাপনে উদ্বিগ্নতা বেড়েছে। 'অর্থ লোপাট', 'শেয়ারবাজার কেলেংকারী', 'স্যুটকেস পাচার', 'ব্যাংক লুট', 'বেগমপাড়া', 'অর্থ পাচার'– এসব কথা তো সাধারণ মানুষের জন্য এ দেশে জীবনযাপনের উপযোগী কোনো সুখকর কথা না। দেশ পথে বসার শামিল। এসব কথা এদেশের মানুষ অনেক দিন থেকেই শুনে আসছে। ইদানীং পত্রিকার পাতায় ও মানুষের মুখে শব্দগুলো বেশি বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। মানুষের দুর্দশা বাড়ছে। তাহলে এইসব আর্থিক লুটপাটের কারণেই কি দ্রব্যমূল্যের বাজার চড়কগাছে উঠে যাচ্ছে? সাধারণ মানুষের তিলে তিলে জমানো ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কোনো ব্যবসায়ী-রাজনীতিক ছলচাতুরী করে রাজনীতির ছত্রছায়ায় নিজ পকেটে ভরে ফেলবে– এটাই-বা কেমন কথা? দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেছে না-কি? এমন ঘটনা তো এর আগে অনেকবারই শুনেছি। এ-ও শুনেছিলাম, একটা ব্যংকের মালিকানা রাজনীতির ছত্রছায়ায় দখলে নেওয়া

হয়েছিল। সেখান থেকেই আবার অর্থ লোপাটের কথা বাজারে আসছে। তাহলে এই অর্থ লোপাটের জন্যই ব্যংকটা দখলে নেওয়া হয়েছিল কি-না এমন কথা দুর্মুখদের মুখ থেকে ভেসে আসা অযৌক্তিক নয়।

আমি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবস্থা পারতপক্ষে মুখে আনতে চাইনে। আবার দেশের সার্বিক পরিবেশ ও মানুষের মনোজাগতিক পরিবেশ, জীবনযাপন নিয়ে কিছু করতে গেলে, বলতে গেলে অবস্থাকে এড়িয়েও চলা যায় না– একটু বললেও বলতে হয়, প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। প্রতিদিনের পত্রিকাটা যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং পোড়া চোখ দুটো সমাজের দিকে মেলে ধরলেই ভূতভবিষ্যৎ মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যায়; আমরা কোথায় যাচ্ছি বোঝা যায়। কথা ছিল রাজনৈতিক নেতারা তাদের কর্মীদের সাথে নিয়ে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা করবে। জনসেবা, সমাজসেবার জন্যই রাজনীতি। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে সবকিছু দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বলা যায়, কোনো রাজনৈতিক দলেরই গঠনতন্ত্রের মূলনীতির সাথে তাদের কথা ও কাজের কোনো মিল নেই। সকল নোংরামি, কুশিক্ষা, কুটিলতন্ত্র ও জিঘাংসার আঁতুড়ঘর এখন এই দিগভ্রষ্ট, নীতিবিবর্জিত রাজনীতি। রাজনীতি এখন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দেশ ও সাধারণ মানুষের সম্পদ লুটপাটের একচেটিয়া ব্যবসা। এরা দেশকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠীর গন্তব্য যে কোথায় তা মনের চোখে ভেসে ওঠে। চোখে ভেসে ওঠাটা হয়তো এ দেশে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ইচ্ছে করে দেখতে চাইনে, তবু চোখে চোখে ভাসে। তাই না-লিখে পারিনে। চোখ বন্ধ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে কেন জানি লাগামহীন দুর্নীতি, লুটপাট, বলদৃপ্ত মিথ্যাচার, দমন-পীড়ন, জিঘাংসা, অব্যবস্থাপনা, কুশিক্ষা, মারামারি, খুনখারাপি, গায়েব, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার দাপট ইত্যাদির ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিভূ চটকদার ভেক ধরে ভিন্ন পথে দেশের সম্পদ লুটপাট করার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, একই উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে। সব বিকৃত ফন্দি-ফিকির বিষবাষ্পের মতো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে, সমাজকে গ্রাস করেছে এবং করে চলেছে। সমাজের দু কূল প্লাবিত করে ছেড়েছে। এ সমাজেই আমাদেরকে বসবাস করতে হচ্ছে। ওদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, এত সুন্দর একটা দেশ, অথচ ওরা জনগোষ্ঠীকে জন-আপদে পরিণত করেছে। এই নীতিহীন, চরিত্রবিধংসী, মনুষ্যত্বহীন, সর্বভুক রাজনৈতিক স্রোতধারা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা উন্নয়নে বিলীন হওয়া জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে, ‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’/দেশ পুড়ে ছারখার হয় সুনীতি বিহনে।

(৫ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।